যে-জীবন সাজঘরের

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সেটা ছিল ১৯৫৩ সাল। পাতিরামের স্টল থেকে দেখা-মাত্র কিনে নিয়েছিলাম কৃত্তিবাস, একটি আনকোরা কবিতা পত্রিকা। না কিনে উপায় ছিল না। দারুণ সুদৃশ্য। দামি কাগজ। ঝকঝকে ছাপা। মার্বেল কাগজে ছাপা মলাট। ভেতরের পৃষ্ঠা ওপরে-নীচে ওয়েভ-রুল দিয়ে সীমানা করা। সম্পাদকীয় শুরুই হচ্ছে এমন একটা লাইন দিয়ে - কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র। তরুণতম কবিদের মুখপত্র ! তার মানে তো, আমাদেরই মুখপত্র ! আমরাই তো তখন সদ্য লিখতে এসেছি! তাই, দেরি না করে, কিনেই ফেললাম। তিন জন সম্পাদকের নাম দেখলাম কৃত্তিবাস —এ। দীপক মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আনন্দ বাগচী। দীপক মজুমদারের নাম, সত্যি বলতে কী, তখনো শুনিনি! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরু দু-একটি কবিতা যেন দেখেছি। তার থেকেও বেশি দেখেছি তাঁর ছোটোদের কবিতা। সাপ্তাহিক আনন্দমেলার পৃষ্ঠায়। সেখানে চুটিয়ে ছাড়া-কবিতা লেখেন আনন্দ বাগচী! দেখাদেখি আমিও পাঠাই ছাপাও হয়া কিন্তু অসামান্য কয়েকটি কবিতা বেরোয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। দেশ-এ কি দেখিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম? মনে হল, দেখেছি। দু-এক বছরের মধ্যেই যেন দেখেছি। তবে আনন্দ বাগচীই তখন সব-থেকে জনপ্রিয় নাম! বুধদেব বসুর কবিতাতে পড়েছি অনন্দ বাগচীর কবিতা। দেশ-এ তো ১৯৫২ সালেই পরপর বেরিয়েছে অনন্দ বাগচীর অসামান্য কয়েকটিঁ কবিতা! সে-সব কবিতা-পঙ্‌ক্তি আজও স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে। এ-ছাড়া, ১৯৫২-তেই আমারও প্রথম কবিতা দেশ পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছে আর তার পর থেকে ঘটে গেছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। দু-হাতে লিখি, চার হাতে পাঠাই সর্বত্র। কিছু ছাপা হয় না, কিন্তু বেশির ভাগই ছাপা হয়। আরো মজার কথা, যেখানেই ছাপা হয়, সে-পত্রিকাতেই থাকে অনন্দ বাগচীর কবিতা। ফলে আনন্দ বাগচীর সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছেটা আগে থেকেই জন্মেছিল। কলেজের দেওয়াল-পত্রিকার জন্য একটি কবিতা-প্রার্থনা করে কিছুকাল আগেই পাঠিয়েছি আনন্দ বাগচীর ঠিকানায় একটি চিঠি। দৈব যোগাযোগই বলতে হবে, আনন্দ বাগচীর কবিতা তো এলই, সেই সঙ্গে এল ওঁর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণও। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যখন সাক্ষাৎ আলাপ, আনন্দ বাগচী আমার কবিতা থেকে বাছাই করে গেলেন একটি সাত লইনের কবিতা। সেই সুদৃশ্য কাগজ, কৃত্তিবাস-এর জন্য! এরপর অপেক্ষা। সত্যি, কৃত্তিবাস-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতেই ছাপা হল আমার সেই কবিতা। সপ্তক। সাতটি লইন সাত রাজার ধন হয়ে এল আমার জীবনে।

স্টল-এ কৃত্তিবাস- দেখে পত্রিকা আনতে ছুটেছিম প্রকাশকের বাড়ির ঠিকানায়। প্রকাশক ছিলেন দীপক মজুমদারা তাঁর ঠিকানা-১২/১ মহারানী হ্রেমন্তকুমারী ষ্ট্রিট-এ হানা দিয়ে হতাশ হতে হল। কাউকেই পেলাম না। আনন্দ বাগচীই পরে বললেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির কথা। নিয়েও কি গিয়েছিলেন, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে যে, সেই থেকে ২বি বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা-৩ হেয় উঠেছিল আমাদেরও সকাল-সন্ধে-দুপুরের নিয়মিত ঠিকানা। কৃত্তিবাস- তো পেলামই। একইসঙ্গে-পেলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদার সহচর্য। ওর তখন সামনে বি এ পরীক্ষা। আমিও কলেজে নাম লিখিয়ে ঘুরে-বেড়ানো এক পদ্যপাগল। বয়সে বছর তিনেকের ছোটই। তবু কি করে যে অন্তরঙ্গতা ক্রমশ বাড়তে লাগল, জানি না। একটা জিনিস হতে পারে যে, আমি তখন থেকেই ছাপার ব্যাপারে অতি খুঁতখুঁতে। কৃত্তিবাস-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় বেরুনো সুনীলচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ বাঁলা কবিতার অগ্নসৃতি-তে ঘটে-যাওয়া একাধিক বানান-ভুল ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিলাম! অথবা প্রথম সংখ্যায় ওর নীলরাগ-এ ব্যবহৃত! ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানতে চেয়ে ওর চোখে পড়ে গিয়েছিলাম। আবার আনন্দমেলায় বেরুনো ওর দু-একটি

ভালোলাগা কবিতা মুখস্ত বলে ওকে চমকে দিয়েছিলাম -এমনটা হওয়াও অস্বাভিক নয়। এমনও হতে পারে, এর কোনটাই নয়, আমাদের আলেচনা জমে উঠেছিল রেড়িয়োর সকালের রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে। কিন্ত যেভাবেই হোক, দু-এক বছর বাদেই আবিষ্কার করি, সুনীলের কৃত্তিবাস-এর ছাপার কাজে আমি নানাভাবে ওকে সহায়তা করছি আরো কেউ-কেউ এসেছে ঠিকই, কিন্তু লেগে থাকেননি। চুর্থ -পঞ্চম সংখ্যাটি যখন যুগ্ম-সংকলন হয়ে বেড়ল, তখন কৃত্তিবাস-এর সম্পাদক হিসেবে একা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামা। সহ-সম্পাদকমণ্ডলীতে পাঁচজন। অনন্দ বাগচী ও দীপক মজুমদার ও সেই তালিকায়। ষষ্ঠ সংকলনে আগের সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় কেউ নেই। শুধু সহ-সম্পাদক উৎপলকুমার বসুর সঙ্গে নড়ূন ফণিভূষণ আচর্য। একা কুম্ভ সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এইভাবেই, আবিষ্কার করলাম যে, একাদশ সংকলন থেকে উৎপলের পাশাপাশি আমার নামও ঢুকে পড়েছে সহ-সম্পাদক হিসেবে। কৃত্তিবাস-এর পুরনো সংখ্যা থেকে বাছাই করে পরে অবশ্য নানা সময়ে একাবিক সংকলন রেরিয়েছে। তার মধ্যে বলা বাহুল্য, সুনীল নিজেই লিখেছন। এইসব কথা। তবে একটা কথা বলি, অনন্দ বাগচীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ স্বগত সন্ধ্যা কৃত্তিবাস প্রকাশনীরও প্রথম বই। কৃত্তিবাস প্রকাশনীর বই হিসেবে বেরিয়েছিল আমারও প্রথম কাব্যগ্রন্থ, অতলান্ত। বড়ো সুন্দর করে সে-বইয়ের বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন সুনীল। একটি লাইন আজও মনে পড়ে- যা সহজ তারই গভীর মুল্য নির্ণয় করা হয়েছে এই বইয়ের প্রতি কবিতায়!, ভাবতে অবাক লাগে, কৃত্তিবাস —এর নানা সংখ্যায় তখন প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের তালিকায় মাঝেমাঝেই বেরুত দীপক মজুমদার-এর আর ইন্দ্রনীল চটোপাধ্যায়-এর কাব্যগ্রন্থের নাম, যদিও তার কোনোটাই শেষ অবধি সূর্যের মুখ দেখেনি। কিন্ত দলপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো গ্রন্থ কোনো বিজ্ঞাপন বহুকাল পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কৃত্তিবাস প্রকাশনীর তালিকায় তো নেয়ই। তবু শেষ অবধি বেরুল। নবম সংকলনে বেরুল সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ একা এবং কয়েকজন -এর বিজ্ঞাপন- সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, কার্তিকের -শেষে প্রকাশিত হবে, দাম 2.৫০ টাকা। পরবর্তী দশম সংকলনের দাম বেরুল ২.৫০ নয়, ২টাকা। একাদশ সংকলনে দেখছি প্রথম সংস্করণের কিছু কপি এখনও অবশিষ্ট আছে।, এবং পঞ্চদশ সংকলনের বিজ্ঞাপন - একা এবং কয়েকজন,- এর আর পাঁচ কপি অবশিষ্ট আছ। এর থেকেও বড়ো চমক এই যে, কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে কিন্ত বেরোয়নি সুনীলের একা এবং কয়েকজন। বেরিয়েছে সাহিত্য প্রকাশক -নামের একটি সংস্থা থেকে। প্রকাশক সমীর রায়চৌধুরী। চইবাসার সেই সমীর রায়চৌধুরী। কিন্ত চাইবাসার ঠিকানা থেকে নয়, প্রকাশকের ঠিকনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ২২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রিট, কলকাতা-৪। ১৯৫৭সালের মাঝামাঝি থেকে যে-ঠিকানায় স্থানান্তরিত সুনীলের বাসা, ফলে কৃত্তিবাস পত্রিকারও কার্যালয়।

২.

কৃত্তিবাস- পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরই ক্রমশ সরে যেতে থাকেন আনন্দ বাগচী। নানা ব্যস্ততায়। দীপক ছিলেন স্বভাব-বাউন্ডুলে, বেশিদিন কৃত্তিবাস পত্রিকা নিয়ে লড়ই চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসন্তব। ইতিমধ্যে কৃত্তিবাস কে কেন্দ্র করে ক্রমশ সাড়াও জাগছে। অলেক লেখা আসছে। অনেক ভিড়ও বাড়ছে। কিন্ত লেখা আনা, লেখা শোনা, লেখা পড়া, সংশোধন করে প্রেস-এ ছাপতে দেওয়া, প্রেস থেকে প্রুফের বান্ডিল এনে সংশোধন করে ফের জমা দেওয়া, কাগজ কেনা, মলাট ছাপা, স্টলে-স্টলে কাগজ পৌছে দেওয়া, তাগাদা দিয়ে বিক্রিবটার টাকা আনা, প্রেসের, বাঁধাইখানার বকেয়া মেটানো, গ্রাহক বাড়ানো, বিজ্ঞাপন জোগাড় করার জন্য ঘোরাঘুরি-এমন অজস্র কাজ সামলাতে হয় সম্পাদককে। কাছ থেকে দেখে বুঝতে পারলাম, সুনীল একাই কী অমানুষিক পরিশ্রম করে। এমনিতেই টিউশন করে হাতখরচ জোগাড় করত, কৃত্তিবাস-এর জন্য আলাদা করে দু-একটা টিউশন করতে হত ওকে। কেননা, টাকটা ওকেই জোগাড় করতে হতো। দেখে-শুনে আমিও হাত লাগালাম। বলতে গেলে সব কাজে। তবে টাকার ব্যাপারে সাহায্য করার সংগতি

ছিল না। কননা, কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার যাবতীয় খরচ যে জোগাড় করতে হত সুনীল জানত। তাই এই সময়টায় আমাকে ও জোগাড় করে দিয়েছে বেশ দু-একটি টিউশন। একটি তো দারুণ লোভনীয় সম্মানদক্ষিণার। টিউশনের ব্যাপারে সুনীলের যেন আলাদা একটা সোর্স ছিল। কী করে যে দুর্দান্ত সব টিউশনি পেত, জানি না। যেমন, এত কাছাকাছি থেকেও কখনো জানতে পারিনি, কখন এত বই পড়ে সুনীল। কখন লেখে পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা চিঠি! আবার কখন রচনা করে চলেছে একটির-পর-একটি চমকে-দেওয়া কবিতা, যা ওকে বহু চারেকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে দিল অন্যতম প্রধান একজন কবি হিসেবে। বস্তুত, কৃত্তবাস -এর একক সম্পাদক হিসাবে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তিলে-তিলে বদলে যাওয়াটাও পঞ্চাশের দ্বিতীয় অর্ধের এক অন্যতম বিস্ময়কর ঘটন।

অথচ, এর মধ্যেই দেখেছি, বি এ পাশ করার পর সুনীল কী হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই চলে যাচ্ছে বাল্যবন্ধু আশুতোষ ঘোষ-এর সঙ্গে বাণীপুরে, সম্ভবত জীবনবিমার চাকরির প্রশিক্ষণ নেওয়ার কোনো সুত্রে । আবার চলে যাচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষার কী-একটা কর্মশালায়, সেই বাণীপুরেই। শিবশম্ভু পাল-এর লেখায় পড়েছি, সুনীল ওকেও দিয়েছিল ওর জীবনের প্রথমতম চাকরির জিলুকসন্ধান। দু-সপ্তাহের জন্য বাণীপুর সাহিত্য কর্মশালায়। সেই ১৯৫৬ সালে, দক্ষিণা ১৮০ টাকা, এ-ছাড়াও যাতায়াত ২০ টাকা। মোট ২০০ টাকার চাকরি। মন্দ কী।

সুনীল যখন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে স্বাস্থ-অধিকারে করণিকের চাকরি পায় এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালের পাশে, মৌলালিতে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের সেই চাকরিতে যোগ দেয়, মইনে ছিল মাসে ১২৫ টাকা। পে-স্কেল ৭০-১৫০ । সেও ছিল ১৯৫৭সালের কথা। তখন এমনইছিল মাইনেপত্তর। বিশেষত সরকারি অফিসে।

তবে সুনীলের চাকরিটা ছিল মজার। বাড়ির তাড়নায় প্রথমদিন, শুনীল তো সকাল ১০টায় হাজিরা দিতে গেছে, কিন্ত অফিসেরই কেউ-একজন ওকে শাসায়: এ-অফিসে বেলা ১২.৩০-১টার আগে হাজিরা দেওয়ার নিয়ম নেই। ভবিষ্যেতে সুনীল যেন এমন ভুল আর না করে। তাতে অবশ্য সব থেকে খুশি হয়েছিলাম আমরা। সুনীলের সেইসব বেকার বন্ধুরা, যারা সকালের আড্ডাটিকে অচিরে প্রসারিত করে খুঁজে নিই ওর অফিসের উলটোফুটের শ্যামল, নামের রেস্তোরাটিকে।

সেখানেই আড্ডা চলত। আড্ডা তখন জমত আরো বহু ঠেক-এ। সুনীলের একতলায় বসার ঘরে, বিজুরিকা কি মলয়গ্রিল নামের রেস্তোরায়। দেশবন্ধু পার্কের গাছতলায়। কফি হাউস-এ। এ-ছাড়াও ছিল দু-একটি সুখাদ্যের ঠিকানা। যেমন, গ্রে ষ্ট্রিটের মুখে, সুধা কেবিন। সেখানে বিকেলের পর পাওয়া যেত মাংসের ঘুগনি আর টোস্ট। আর ছিল কখনো কখনো শ্যামবাজারের গোলবাড়ির বিখ্যাত কষা মাংসের দোকন। আমার মনে আছে, একেকদিন সন্ধ্যেবেলা সুনীল হঠাৎ আমাদের মতো পাঁচ ছ-জন বন্ধুকে নিয়ে হাজির হত কষা মাংসের দোকানে। ওর পকেটে হয়তো সেদিন টাকা নেই। তাতে কী। তখন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় একটি কবিতা ছাপা হলে মাস দুই-আড়াই বাদে নগদ দশ টাকা পাওয়া যেত। সুনীলের হয়তো তেমন কোনো কবিতার টাকা তখনো আসেনি। সেই দশটা টাকা পুরো দেওয়া হবে, এই মর্মে প্রতিশ্রুতি কোনো বন্ধুর কাছ থেকে সুনীল ধার করে নিত সাড়ে সাত টাকা। আড়ইটাকা সুদের লোভেইহোক, কী মজার ঝোঁকেই হোক, ধার জুটে যেত ঠিকই, খাওয়াও হত বেশ তারিয়ে তারিয়ে। এখানে বলি, তখনো এর বেশি নেশা ছিল না কৃত্তিবাস-সম্পাদকের। সুনীল সেই যে একবার লিখেছিল, আমি যখন দুই বন্ধুর সঙ্গে মিলে কৃত্তিবাস পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে তে যুক্ত হই, তখন সবে আমি উনিশ বছর পেরিয়ে কুড়িতে পা দিচ্ছ, মুখে দুধের গন্ধ, অর্থাৎ

তখনো সিগারেট খাই না !, কথাটা বর্ণে-বর্ণেসত্যি! আড্ডা আর সিনেমা দেখা ছাড়া অন্য কোনো নেশা আমি অন্তত দেখিনি সুনীলের। পরে অবশ্য তাস খেলতে দেখেছি ওকে! নীরেনদার ওখানে- ভাস্করের বৈঠকখানায়।

আড্ডার কথা তো এসেছে, সিনেমা দেখার প্রসঙ্গটা বলা। সুনীলের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ, তখনই দেখেছিও সিনেমার পোকা। প্রচুর খবরাখবর ওর নখদর্পণে। শুধুকি তাই? প্রতি রবিবার ছোটোদের লেখক স্বপন দাস-এর সঙ্গে ও চলে যেত মর্নিং শো-তে, কোনোনা-কোনো বিদেশি সিনেমা দেখবে বলে! এভাবে রাধা-তে আমিও একবার দেখেছিলাম হিচককের স্টেজফ্রাইট! আরেকবার সঙ্গী ছিলাম চৌরঙ্গিপাড়ায়। রাতের শো। সেবার দেখলাম সিগনেট বুকশপে কাউন্টারে-দেখা তরুণ সল্‌ম্যানটি-ধীর পোশাকি নাম সুনন্দ, ডাকনাম বুড্‌টা-শো-শুরুর কিছু আগে এসে যোগ দিল। হাতে অনেকগুলো মর্টন রোল। নিজামের সুবিখ্যাত রোল খেতে-খেতে সিনেমা দেখা, সে-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অন্তত আমার এমন অভিজ্ঞতা ছিল না। মাঝরাতে সিনেমা ভাঙল। সেদিন আর নিজের বাড়ি ফিরতে সাহসে কুলোয়নি। সুনীল আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল ওরু বৃন্দাবন পাল লেনের একতলার ঘরে। মনে আছে, সে-রাতেই প্রথম সুনীলের মাকে অন্নপূর্ণারূপে দেখলাম। দুটো থালা সাজিয়ে এনে টেবিলে রেখে গেলেন। গরম ভাত আর সর্ষে দিয়ে ঝাঁঝালো কই-পাতুরি। পরে অবশ্য আরো বহুবার খেয়েছি। শ্যামপুকুরে, সাতগাছিতে। মায়েদের হাতের রান্নায় বোধহয় ভোগের খিচুড়ির মতোই আলাদা একটা মাত্রা যুক্ত হয়! জিভে যেন আজও লেগে আছে সেই সুস্বাদ।

৩.
সুনীলের একটা ছোটো জীবনপঞ্জির দিকে এবার নজর দেওয়া যাক।
জন্ম: ২১ ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪),
স্থান: মহিজপাড়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
মা : মীরা।
বাবা: কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়।
দুহ ভাই : অনিল ও অশোক। একমাত্র বোন : কণিকা।

সুনীলের বাবা ছিলেন টাউন স্কুলের শিক্ষক। মুখ্যত ভূগোলের, তবে অন্য বিষয়ও পড়াতে হত। টাউন স্কুল থেকেই ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সুনীল। আই এস সি পড়তে ভরতি হয় সুরেন্দ্রমোহন কলেজে। এক বছর সেখানে পড়ে, সেকেন্ড ইয়ারে সুনীল কলেজ বদল করে। ভরতি হয় দমদম মতিঝিল কলেজে। ওখানে ওর এক মামা, সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, খ্যাতনামা অঙ্কের অধ্যাপক।

দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে আই এসসি পাশ করে সুনীল ভরতি হল আমহার্স্ট ষ্ট্রিটের (এখন রাজা রামমোহন সরণিতে) সিটি কলেজে। ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়ে। কিন্ত অনার্সপরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। পাস কোর্সেই -পাশ করে বিএ।সেটা ছিল ১৯৫৪ সাল। বিএ পাশ করে সরাসরি এম এ ক্লাসে ভরতি না হয়ে, চাকরির কথা যে ভেবেছিল সুনীল তা বোধহয় মুখ্যত এই কারণেই যে, সুনীল ছিল বাড়ির বড়ো ছেলে। শুধু তাই নয় বাড়ির প্রতি যথেষ্ট দায়িত্বশীলও। টিউশনির টাকা থেকেও মায়ের হাতে মাসান্তে কিছু-না-কিছু তুলে দিয়েছে সুনীল, চাকরি না-পাওয়া পর্যন্ত। ভাই-বোনেরা তখনো পড়াশুনা করে চলেছে। ওর মেজোভাই অনিল, আমারই ব্যাচমেট। বাংলা অনার্স ও এম এ। পাশ করে যোগ

দেয় অধ্যাপনায়। অশোক কাজ পায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টারিতে। কণা, মানে ছোটো বেন কণিকা, অনার্স নিয়ে বি এ পাশ। পরে কি এম এ করেছিল? মনে পড়ছেনা। তবে বিয়ের পর চাকরি করত বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনির মধ্যেকার একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। গানের গলা তিন ভাইয়েরই ভালো। তবে সুনীলের প্রথাগত তালিম হরবোলা ণাটকের গ্রুপে, বটুকদা মানে স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সন্তোষ রায়-এর কাছে। আনিল রবীদ্রসংগীতের পাঠ সমাপ্ত করেছে দক্ষিণী থেকে। অশোক ছিল অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছাত্র। ওর ছিল ঈশ্বরদত্ত গানের গলা। সুনীলরা যখন দমদমের সাতগাছিতে, অশোকের তখন গহিয়ে হিসেবে পাড়ায় এতই সুনাম যে, একদিন পথচলতি সুনীলের কানে এল, চায়ের দোকানের দু-তিনজন তরুণের মন্তব্য: ওই দ্যাখ। অশোক গাঙ্গুলির দাদা যাচ্ছে। এই ঘটনাটা সুনীলের মুখেই শোনা।

যাই হোক, বিএ পাশ করার চার বছর পর কী মনে করে যেন সুনীল টুক করে পাশ করে নিল প্রহিভেট এম এ। নিছক অকারণেই। কেননা, সরকারি করণিকের পদে এর ফলে না হয় পদোন্নতি না ঘটে বেতনবৃদ্ধি। যেমনটা ঘটে ব্যাঙ্কে বা কেন্দ্রীয় সরকার অফিসেও ঘটত একদা।

১৯৫৯ সাল নাগাদ জেনসেবক নামক কংগ্রেসি দৈনিক সংবাদপত্রের বার্তা-সম্পাদক (কার্যত সর্বময় কর্তা) শান্তিকুমার মিত্র আমার মাধ্যমে একটা চাকরির প্রস্তাব দিলেন সুনীলকে। কী? না, ওঁদের রবিবাসরীয় পাতার সম্পাদনা করতে হবে। পার্ট-টাইম কাজা বিকেলে কি সন্ধেবেলায় গেলেই চলবে। জেনসেবক ততদিনে উত্তর কলকাতার বাগানের আস্তানা মধ্য-কলকাতায়। লোটাস, সিনেমা হলের পাশে নিজেদের একটা বাড়িতে। সুনীল যে আমাদের খুব কাছের বন্ধু, শান্তিদা জানতেন। কবি হিসেবেও করতেন সম্মান। আর আমি তখন পাকে-যে বো-ব্যারাকের একটা ছোট্ট এক-কামরা ফ্লাটের বাসিন্দা। কাজ করি রইটার্সে। শান্তিদা আর খাদি গ্রামোদ্যোগের এক সেলসম্যান ব্রজেনদার সঙ্গে ঘরভাড়ার তিন ভাগের এক ভাগ টাকা দিয়ে থাকি। দু-বেলা খই বউবাজারের মোড়ের বঙ্গালক্ষ্মী হোটেলে। সেখানে বহুদিন মাছর মুড়ো খেতে সঙ্গী হয়েছে সুনীল। শান্তিদা এসসব কথাও জানতেন। তাই আমার মারফত সুনীলকে খবর পাঠালেন। প্রথমটায় একটু ইতস্তত ভাব ছিল সুনীলের, পুরো কংগ্রেসি কাগজে চাকরি! কিন্ত কাজটা তো সাহিত্যের, এর সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক! আমি ছাড়াও দু-তিনজন কাছের বন্ধুরা এই পরামর্শ বোধহয় মনে ধরেছিল সুনীলের। সুনীল কাজটা নিয়েই নিল। এখানেইও সহকর্মী হিসেবে পায় প্রিয় কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে। এ-নিয়ে সুনীলের স্মৃতিকথাও পরে পড়েছি।

সুনীলের এই নতুন চাকরিতে শুধু সুনীলেরই আর্থিকি সুরাহা হয়েছিল তা নয়, আমাদেরও লাভ হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে নানা ধরনের ফিচার লিখে কিছু উপরি আয়ের। আর একটা লাভ এই-যে, আড্ডার একটা নতুন ঠেকও যুক্ত হল আমাদের হুল্লোরময় জীবনো! জনসেবক,-এর চাকরিটা যেমন, সরকারি চাকরিটাও তেমনই সুনীল ছাড়েনি, পাশাপাশি টিউশনিও চালিয়ে গেছে। এমনকী ওর যখন বিদেশ যাবার সুযোগ এসে গেল এবং আইওয়াতে বছর খানেক কাটিয়ে আবার ফিরেও এল, তখনো চাকরি ছাড়ার কথা শুনিনি। জনসেবক-এ অবশ্য নতুন লোক কাজ করাছিল এই ছুটিতে। কিন্ত সরকারি চাকয়িটা তো টানা পাঁচ বছর কামাই না করুলে তখন যেত না, ফলে গিয়েছিল বলে মনেও হয় না। তবে লক্ষ করেছি, বিদেশ থেকে ফিরে সুনীল পুরনো চাকরির দিকে ফিরেও তাকায়নি। চেষ্টা করছিল, আনন্দবাজার-এ যদি কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। হয়েও ছিল, সে-কথায় আসছি।

এখানে বলি, সুনীলরা শ্যামপুকুর ষ্ট্রিটের বাসা ছেড়ে দমদমের সাতগাছিতে চলে আসে ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে। ৩২/২ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা ২৮- এই ঠিকানায়। অনেকগুলো কারণে শ্যামপুকুর ছেড়ে আসা। প্রথমত, ঠিক এক বছর আগে, ১৯৬১-র জানুয়ারী মাসে মাত্র ৫০ বছর বয়সে মারা গেলেন বাবা। মাসিমার মন টিকলনা। যোগীপাড়ার বাড়ি থেকে অল্প দুরেইছিছল সুনীলের মামাবাড়ি। ওখানে সুনীলদেরও কাঠা পাঁচেক জমি কেনা ছিল। ১৯৬১ সালের জানুয়ারীতে আমিও মা আর ছোটো বোনদের নিয়ে আলাদাভাবে একঘরের বাসা নিয়েছি দক্ষিণ কলকাতায়। মনে আছে, সুনীলের মা, বোন কণা, সঙ্গে আমি ও আমার মা আর ছোটো বোন- তখন যোগীপাড়ায় একসঙ্গে বাড়ি খুঁজছি বেশ কয়েকদিন। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছি সুনীলের কালু মামার ওখানে। অনেক পরে অবশ্য কথা হয়েছিল, সুনীল ওর মায়ের জন্য যে-বাড়িটা বানাবে, আমি যেন সেখানেই ছাদের ওপর একটা আস্তানা বানিয়ে থাকি, কেননা তখন আমার মেয়ে পড়ত দমদমের অক্সিলিয়াম কনভেন্ট-এ, সাতগাছি থেকে অনতিদূরে। কিন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। সুনীল অবশ্য কথা রেখেছিল, মায়ের জন্য বানিয়ে দিয়েছিল চমৎকার একটি বাড়ি।

৪.

যোগীপাড়া রোডের বাড়ির ঠিকানায় খুব হইহই করে বিয়ে হয়েছিল কণার। সেটা ছিল ১৯৬৫সাল! সুনীলের ছোটো দুই ভাই ততদিনে চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠা আবার ওই ঠিকানা থেকেই বেরিয়েছিল সুনীলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ: আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি। এবার অবশ্য কৃত্তিবাস প্রকাশনীর পক্ষ থেকে। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়-এর নাম ছিল প্রকাশক হিসেবে। উৎসর্গ সমীর রায়চৌধুরী কে, যাঁর উদ্যোগে সুনীলের প্রথম বই একা এবং কয়েকজন। এর পরের কাব্যগ্রন্থ থেকে সুনীলকে আর প্রকাশক খুঁজতে হয়নি। ততদিনে ও সুপ্রতিষ্ঠিত। অরুণা প্রকাশনীর বিকাশবাবু (বাগচী) ছেপেছন বন্দী, জেগে আছো। য়ার পরিবেশক সিগনেট বুকশপ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশনাসংস্থা থেকে বেরিয়েছে আমার স্পপ্ন ১৯৭২-এর এপ্রিলে। পশিাপাশি ভারবি থেকে শ্রেষ্ঠ কবিতা এভাবেই চলে এসেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা-য় প্রথমদিকে সুনীল ঠিক চাকরি যাকে বলে তা পায়নি। সন্তোষকুমার ঘোষ ওঁকে অর্পণ করেছিলেন দেশে-দেশে, নামে একটি পৃষ্ঠার সম্পাদনার দায়িত্ব যা প্রতি সপ্তাহে একদিন বেরুত। নীল উপাধ্যায়, ছদ্মনামে যাবতীয় লেখা সুনীল একাই লিখে পৃষ্ঠা ভরাত। আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়তে প্রতি সপ্তাহে একটা জনপ্রিয় ফিচার একদা লিখত সুনীল; বরণীয় মানুষ, স্মরণীয় বিচার। ১৯৬৩-তেই সেটি বই হয়ে বেরিয়েছে গ্রন্থপ্রকাশ- থেকে। বিদেশ-ফেরত সুনীল শুরু করে দিল নীললোহিত- ছদ্মনামে চোখের সামনে নামে একটি সাপ্তাহিক ফিচার, সেই রবিবাসরীয় আনন্দবাজার-এই (অবশ্য নিললোহিত ছদ্মনামে সুনিলের প্রথম ফিচার বিশেষ দ্রষ্টব্য- তার আগেই বের হয় দেশ, পত্রিকায়) দেশ- পত্রিকায় সাগরদা (সাগরময় ঘোষ) ওকে দিলেন অন্য দেশের কবিতা নামে সাপ্তাহিক ফিচার। এভাবেই খুচরো কাজকর্ম করে বেশ কিছুকাল চালিয়েছিল সুনীল। পাশাপাশি, বিদেশে থাকাকালীন ত্রিস্তান ও ইসেল্ট-এর একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রেমের কাহিনি রম্য ভাষায় বাংলায় লিখতে শুরু করেছিল সুনীল। এ-দেশে ফিরে সেটিও শেষ করে। সোনালি দুঃখ- নামে বইআকারে ১৯৬৫ সালে বার করে অরুণা প্রকাশনী। অচিরে জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে এই প্রণয়-উপাখ্যান।

১৯৬২সাল নাগাদ যুবক-যুবতীর নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করে সুনীল। সেটির অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আমার জিম্মায় রেখে বিদেশে পাড়ি দেয়। সময় সুযোগ পেলেই সেই উপন্যাসের কয়েকটি কিস্তি লিখে আমাকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিত। তখন তো জেরক্স মেশিনের চল ছিল না। আমি করতাম কী, হাতে লিখে কপি করে নিতাম সুনীলের

পাঠানো পৃষ্ঠাগুলি। তারপর একদিন, যখন পুরো উপন্যাস শেষ, আমার কাজ দাঁড়াল, কপি-করা পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে দু-একজন চেনা প্রকাশকের দোরে হানা দেওয়া। কলেজ ষ্ট্রিট পাড়ার প্রকাশকরা অনেকেই তখন মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে দরজা: না মশাই অচেনা লেখকের উপন্যাস ছাপার ঝুঁকি নিতে পারব না। অবশ্য সুনীলকে এতসব হতাশার কথা শোনাইনি আমি। কারণ, ও যে ক্রমশ পায়ের তলায় জমি পাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এরপর সাগরদা যখন ১৯৬৬-র পুজোয় শারদীয় দেশ- পত্রিকার জন্য সুনীলের উপন্যাস চহিলেন, ফেলে আত্মপ্রকাশ বেরুল, তখন তো একটা ছোটো পত্রিকাও যুবক-যুবতীরা, ধারাবাহিক ছাপবে বলে এগিয়ে এল। বলাই যায়, সুনীল এখন সাজঘর ছেড়ে মূল মঞ্চে প্রবেশের জন্য পুরোপুরি তৈরি। সে-সব ঘটনা এখন সুনীলের প্রতিটি পাঠকের জানা। এ-ও জানা যে, ১৯৬৭ ছিল বছরভর কৃত্তিবাসীদের বিবাহ। ৬৭-র ফেব্রুয়ারিতে সুনীল- স্বাতীর বিয়ে দিয়ে যার সূচনা। মার্চে সমরেন্দ্র-আরতির, জুলাইতে শরৎ-বিজয়ার, আগস্টে আমার-শ্রাবণীর। পুপলু মানে শৌভিকের জন্ম ১৯৬৭-র ২১ নভেম্বর।

৫

কথা বেড়ে যাচ্ছে তাই এবার বন্ধ করি সাজঘরের এই স্মৃতির ঝাঁপি। প্রসঙ্গাত বলি, সুনীলকে নিয়ে লেখালেখি করার মস্ত বিপদ এই যে, সুনীল নিজে যেসব স্মৃতিকথা নানা জায়গায় লিখে গেছে, তাতে কিছু-কিছু সাল-তারিখ আর ঘটনাক্রমের বিপর্যয় ও বিস্মৃতি অজান্তেই ঘটে গেছে। দু-একটা কথা বলি বরং। শেষ থেকেই শুরু করা যাক।

সুনীল সম্পাদিত কৃত্তিবাস-এর সর্বশেষ সংখ্যাটি বেরিয়েছে পুজোর আগে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২ সংখ্যা। দেখলাম, ক্রোড়পত্র হিসেবে ছাপা হয়েছে ১৯৬০-এর সনেট সংখ্যা কৃত্তিবাস-এর অংশবিশেষ। পুরনো সম্পাদাকীয়টিও রয়েছে এখানে। যে কোনো রকম প্যাটার্ন পোয়েট্রি উৎসাহের যোগ্যও নয়, আমাদের বিশ্বাস —তখন লিখেছিল সুনীল। এখানে কিন্তু একটা খটকা লাগে। মনে পড়ে যায়, কৃত্তিবাস-এর দ্বিতীয় সংকলনেই (হেমন্ত ১৩৬০) তো বেরিয়েছিল সনেট সপ্তক। শঙ্খ ঘোষ, অরবিন্দ গুহ, যুগান্তর চক্রবর্তী, সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, মিহির সেন ও রোহীন্দ্র চক্রবর্তী -তখনকার দিনের প্রধান সাত জন কবির সাতটি সনেট ছাপাও হয়েছিল। -মাত্রই সাত বছর আগে। এর উল্লেখ অন্তত থাকলে যে ভালো হয়, সুনীলের মনে পড়েনি। এ-ও মনে পড়েনি কৃত্তিবাসের এক বাছর-এ (৪-৫সংকলন ১৩৬১) সুনীল নিজেই আক্ষেপ জানিয়েছিল এই বলে যে অরবিন্দ গুহ আরেকটু মনোযোগী হলে, মুহূর্তের ভুলে-র মতো নিটোল সনেট তাঁর কাছ থেকে আরো পাওয়া যেত। এ কি সনেটকেই উৎসাহ-জোগানো নয়, কেননা মুহূর্তের ভুলে তো ২য় সংখ্যায় বেরুনো সনেটেরই নাম!

এ না হয় ঠিকে ভুল! ১৩৮২-র সাহিত্য সংখ্যা। দেশ পত্রিকায় কথাকার জীবনের, স্মৃতিকথাতে সুনীল লিখেছে (২০২পৃ.), বাবা মারা যাবার পর আমি সকালে একটা টিউশনি, দুপুরে চাকরি, বিকেলে আর একটা টিউশনি, সন্ধ্যের পর আবার একটি ছোটো খবরের কাগজের অফিসে চাকরি-মোট চার রকম কাজ করি।

এরই মধ্যে একবার টুক করে প্রাভেটে এম এ পরীক্ষা দিলাম। নিছক অকারণেই।
পড়লে মনে হয়, এ-সবই ঘটেছেবাবার মৃত্যুর পর। কিন্তু বাস্তবে, সুনীলের বাবার মৃত্যু শ্যামপুকুরে, ১৯৬১ সালের ২৯ জানুয়ারীতে। সুনীল এম এ পাশ করেছে তার দুবছর আগে। জনসেবক-এর চাকরিতেও ঢুকে গেছে বছর খানেক আগেই।

শেষ করার আগে, আরেকটি ভুলের কথা বলি। তা হল, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা ঠিক করে ছাপা হয়েছিল? সুনীল লিখেছে, আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫০ সালের কোনো এক মাসে দেশ পত্রিকায়, কবিতার নাম একটি চিঠি। দ্রষ্টব্য : কবিতার সুখদুঃখ দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯ পৃ. ২৬২। কিন্তু সত্যি কি তাই? দেশ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায়, ৫০ বছরের কবিতার ইতিহাস লেখার জন্য আমি যখন তন্নতন্ন করে হাতড়াচ্ছি প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে দেশ- সাপ্তাহিকের প্রতিটি সংখ্যয়, তখনই আবিষ্কার করি যে, সুনীলের প্রথম কবিতা যে একটি চিঠি -এতে ভুল নেই। কিন্ত ১৯৫০-এ নয়, এ-কবিতা ছাপা হয়েছিল ১৮ বছরে-পড়া দেশ- পত্রিকার ২২তম সংখ্যায়। খোলসা করে বললে, ১৯৫১ সালের ৩১ মার্চ, (১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৭ চৈত্র) সাপ্তাহিক দেশ-এ । তা-ও শ্রী সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামে। সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামে বছর কয়েক আগে এক লেখক সত্যিই দেশ, পত্রিকায় লিখতেন গল্প আর কবিতা। তাঁর লেখা নিতান্তই সরল, সেকেলে এবং পদ্যগন্ধী। যেমন, এরোপ্লেন বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন, মাটির ও আকাশের তুমি হাইফেন,/এরোপ্লেন। (১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৫০)। এই সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় যে আমাদের সুনীল, অন্তত আধুনিকতর কেউ, তা কিছুটা মনে হয়েছিল একটি চিঠি-র লেখনরীতি ও আধুনিক উপমা ও শব্দ-ব্যবহার দেখে। সন্দেহ অনেকটা মিটল, পরের বছর এসে, যখন ১৯ বছরে ১৭তম সংখ্যার দেশ-এ বেরল স্বপ্নবাসবদত্তা-, কুমারবর্জিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে। সত্য আরো সুদৃঢ় হল, সুনীলের নিজের জবানিতে।

একটি চিঠি-তে সুনীল তাঁর তৎকালীন হাদয়েশ্বরী বালিকাটিকে সাংকেতিক ভাষায় সম্বোধন করেছিল বলাকা বলে, কবিতার সুখদুঃখ- নামের আত্মস্মৃতি থেকে এ-কথা জনার পর, আমার মনে হয়েছিল যে, বালিকাকে বলাকা করা থেকে যে সংকেতিক খেলার সূচনা সুনীলের কবিতায়, তারই সার্থকতম পরিণতি বোধহয় নীরা-সুনীলের অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতাবলির কেন্দ্রে যার অবস্থান। নীরা ও কি মূলে চিরন্তন সেই নারী, যার বর্ণ আদলবদল করে রচিত এই নাম-নীরা ?

এই সংশয়টুকু জাগিয়ে দিতে পেরেছিল সুনীল নিজেই, কারণ সুনীল স্বয়ং বিশ্বাসী ছিল না কবিতার ব্যাখ্যায়। কবিতার শব্দ দিয়ে নাড়াচাড়া করা যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যাপার, একটু অসতর্ক হলেই আঙুল যাবে ঝলসে কিংবা ঘটবে তুষারক্ষত, সুনীল নিজেই জানত এ-কথা। তই তাঁর প্রথম বইতে আমাদের প্ররোচিত করেছিল এই বলে-

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও-
গভীরে যাও গভীরে যাও দু-হাতে ধরো আঁধার,
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার!

তাই তো বালি খোঁড়ার এই চেষ্টা!
পুনশ্চ : সুনীলের সামগ্রিক কাব্যজীবনে হয়তো একটি চিঠি আজ মূল্যহীন, যেটুকু মুল্য তা নিতান্তই ঐতিহাসিক, তবু অতি সম্প্রতি এ-কবিতা নিয়ে এখটু-আধটু আলোচনা হচ্ছে, কান পাতলেই শোনা যায়। তাই পড়েই শোনাই বরং-

একটি চিঠি

শ্রী সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বলাকা, তোমার শুভ্র চোখেতে পায়নি ঘুম?
জানো নাকি এটা কুয়াসায় ঢাকা।
রাত নিঝুম!
স্বপ্ন দেখো না? এখোনো কি তার
সময় নয়?
বলাকা, তুমি কি পেয়েছো ভয়?
জানো নাকি আমি পথে ঘুরে ঘুরে, দৃশেহারা-
আকাশের মায়া গান গেয়ে করে গৃহছাড়া।
তোমার বাঁশীতে ফু দিয়েছি আমি
সেই ধ্বনি-
বলাকা এই কি জাগরণী?
মরু পর্বতে ঘূর্ণি ঝড় যে হোল সুরু।
আকাশের বুকে মেঘ শীশুদেরে
গুরু গুরু

হিংস্র নখরএখনো লুকোয় বাঁকে বাঁকে
সরল কুমারী বোবা চোখে শুধু
চেয়ে থাকে।
সমুদ্র-ঝড় আসেনি এখনও মনে মনে?
বলাকা-হৃদয় এখনও কি শুধু দিন গোণে!
মন উত্তাল পাখী শুধু ডাকে বোবা যুগে,
ফেরারাঁ বাহিনী বছর কাটায়
উদ্যোগে।
মনের সূর্য তবুও ভাঙবে অন্ধ ঘোর
বলাকা তুমি কি দেখোনি ভো?
হৃদয় জাগানো পরশমণির সন্ধানেই
তাইতো অলস দুপুর যাপনে
শঙ্কা নেই!
স্বপ্ন-সাগরে দিয়েছি নিজেকে
বৃসর্জন
বলাকা, তেমার গ্রন্থি হবে না উন্মোচন?